বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ একটি সমীক্ষা

নাসিরউদ্দীন আহমেদ

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার ধারণা ও ব্যবহার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। এটা শুধুমাত্র উন্নয়নের গতি-ধারা ত্বরান্বিত করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। স্থানীয় সরকার এই পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের চাহিদা, এলাকার নির্দিষ্ট তারতম্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সম্পদ বিভাজনের প্রয়াস পায়। স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো (১) স্বশাসন ; (২) স্বতঃস্ফূর্ততা ও (৩) জনগণের অংশগ্রহণ।[১] উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়নের সুফল ভোগ করাকে জনগণের অংশ গ্রহণ বুঝানো হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।[২] 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র' বলতে তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বশাসিত গ্রামকে বুঝাতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিরাজমান ঃ (১) জেলা পরিষদ, (২) উপজেলা পরিষদ, (৩) ইউনিয়ন পরিষদ ও (৪) পৌরসভা/ পৌরকর্পোরেশন। বর্তমান নিবন্ধে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর আলোক-পাত করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো এই যে সম্প্রতি জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উপজেলা সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে সরকার উন্নয়নের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেবার মানসে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি নুতন পদক্ষেপ।[৩] উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার সমযোগে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা ও বাজেট পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে স্থানীয় সরকার স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।[৪]

উপজেলা সৃষ্টির আগে উন্নয়ন সার্কেলের সংখ্যা ছিল ৪৪২টি। প্রতিটি থানার জন্য বৎসরে ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ১৯৮২-৮৩ অর্থ

বৎসরে ৪৪২টি উন্নয়ন সার্কেলের জন্য পূর্ত কর্মসূচীর আওতাধীন মোট ১৪৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত অর্থ পূর্ত কর্মসূচীর আওতাধীন গ্রামীণ বস্তুগত অবকাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়ন, যেমন রাস্তাঘাট, পুল ও কালভার্ট নির্মাণ, কৃষি ও সেচ সুবিধার জন্য খাল খনন ও পুনঃ খনন, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, জোড়াবাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করার পর উপজেলাগুলোর উন্নয়ন কর্মতৎপরতা বিভিন্ন খাতে বহুগুণ বেড়েছে। প্রতিটি উপজেলা বর্তমানে প্রায় ৩০ হতে ৭০ লক্ষ টাকা জাতীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসাবে বরাদ্দ পাচ্ছে।[৫] জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রথমে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশনামালা জারি করে এবং ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে সংশোধিত নির্দেশনামালা জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশনামালায় উপজেলা পর্যায়ে খাতওয়ারী বিনিয়োগের অনুপাত এবং উন্নয়ন প্রকল্প তৈরী, প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য নিবন্ধে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারী নির্দেশাবলী বিশেষ করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ-নামালা যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন খাতের প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্ধারিত প্রকল্প ছকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এই নিবন্ধে ১৯৮৩-৮৪ হতে ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বৎসরের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিবন্ধটি ক'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, উপজেলা উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনামালার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থতঃ উক্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সমস্যাবলী চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে কতিপয় সুপারিশমালা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই নিবন্ধে প্রাথমিক তথ্য এবং বই ও পত্রিকা, প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ৫-১৭ অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের জন্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন-এর ওপর দু'-সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের ৬২ জন অংশ গ্রহণকারী চেয়ারম্যানের মধ্য থেকে দৈব চয়নের ভিত্তিতে ৪০ জনকে নির্বাচন করা হয়। খোলাখুলি মত বিনিময় এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া

সমস্যার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য গত নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ও মার্চ, ১৯৮৭ সালে টাংগাইল জেলার মির্জাপুর, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ও মেহেন্দিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল এবং ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় শিক্ষা সফর করা হয়। উপরোক্ত উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সভায় যোগদান, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন, পরিষদের সরকারী ও বেসরকারী সদস্য এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত ষষ্ঠ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কোর্সের ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং তাদের ফিডব্যাক নেয়া হয়। সর্বোপরি, লেখকের প্রায় দু'বছর উপজেলায় চাকুরির অভিজ্ঞতা এ নিবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছে। প্রাথমিক তথ্য ছাড়াও বই, প্রতিবেদন ও সাময়িকী থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনামালা

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হলো উপজেলা পরিষদ (পরিশিষ্ট ক-এ উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো দেয়া হয়েছে)। পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিষদকে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক পাঁচশালা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে বলা হয়েছে। উপজেলায় দু' ধরনের বিষয় রয়েছে ঃ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধুমাত্র হস্তান্তরিত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকবে। জাতীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করেছেন ঃ[৬]

(১) কৃষি (সম্প্রসারণ)
(২) গবাদি পশু
(৩) মৎস্য
(৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
(৫) জনস্বাস্থ্য (গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন)
(৬) প্রাথমিক শিক্ষা
(৭) সমবায় (সম্প্রসারণ)
(৮) সমাজ সেবা
(৯) ত্রাণ (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী)
(১০) পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।

১৯৮২ সনের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের ৪০ ধারা মোতাবেক জাতীয় সরকার উপজেলাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সম্যক পরিকল্পনা, নক্সা ও বাস্তবায়নের জন্য ৩১শে জুলাই, ১৯৮৩ সনে একটি উপজেলা নির্দেশনামালা জারী করে যার ভিত্তিতে বিগত

১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সনে উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত দু'বৎসরে উপজেলা পরিষদগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা হয় এবং এর নিরীখে একটি সংশোধিত নির্দ্দেশনামালা গত ১৩ই জুলাই, ১৯৮৫ সনে জারী করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দ্দেশনামালা যথাযথ অনুসরণের জন্য উপজেলা পরিষদগুলোকে বলা হয়েছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন এই নির্দ্দেশনামালা ? নির্দ্দেশনামালা জারীর পক্ষে যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

(১) দেশের ৪৬০টি উপজেলাকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে যার বিবরণ নীচে দেয়া গেল ঃ

সারণী—১

উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী

আর্থিক বৎসর	এডিপি (সংশোধিত)-তে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	এডিপির (সংশোধিত) স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দের(%)
১৯৮৩-৮৪	১৭০·৯৫	৮·৮৫
১৯৮৪-৮৫	২০০·০০	১০·৩৪
১৯৮৫-৮৬	২০০·০০	১০·৪৬
১৯৮৬-৮৭	১৬০·০০	৮·৮
মোট ঃ	৭৩০ ৯৫	

উৎস ঃ উপজেলা সেল, পরিকল্পনা কমিশন।

উপরের সারণীতে ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বৎসর থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত জাতীয় সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী সংশোধিত এডিপির স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ দেখান হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সরকার উপজেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছেন। যেহেতু সরকার অর্থ দিচ্ছেন, সংগত কারণে উক্ত অর্থ যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকার নির্দ্দেশনামালা জারী করেছেন।

(২) জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পরিষদের উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত নির্দ্দেশনামালার প্রয়োজন। এর ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকাতে উপজেলাগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি নিরূপণের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা কমিশন উক্ত নির্দ্দেশনামালা প্রদান করে।

(৪) উক্ত নির্দ্দেশনামালা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনমুখী খাতে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ২০% ব্যয় করা হয়েছে।[৭] উপজেলা উন্নয়ন তহবিল দিয়ে মিঠা-পুকুর উপজেলায় কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল ও দোকান নির্মাণ, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ও মোটর সাইকেল কেনা হয়েছে। সিংড়া উপজেলায় জুনিয়র হাই স্কুল নির্মাণ এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৪টি টেলিভিশন সেট ক্রয় করা হয়েছে। শেরপুর উপজেলায় টেনিস খেলার মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইটনা, কেন্দুয়া মধুখালী ও অন্যান্য উপজেলায় মাটির কাজ করা হয়েছে।[৮] উল্লেখ্য, এসব কাজ নির্দ্দেশনামালার পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ৪০ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রায় সবাই (৩৮) উক্ত নির্দ্দেশনামালা জারীর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা সবাই খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের মতে, এটা স্থানীয় পরিকল্পনার আদর্শের পরিপন্থী। এর ফলে উপজেলাগুলোর আঞ্চলিক তারতম্য, অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।[৯]

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুলাই, ১৯৮৩ সালে জারীকৃত উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দ্দেশনামালায় উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিম্নলিখিত পাঁচটি খাতে কেন্দ্রীভূত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(ক) কৃষি ও সেচ এবং শিল্প বিশেষতঃ কুটির শিল্প, (খ) ভৌত (বস্তুগত) অবকাঠামো, (গ) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, (ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং (ঙ) বিবিধ তৎপরতা। এই নির্দ্দেশনামালায় বর্ণিত বার্ষিক উপজেলা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি নিম্নে দেয়া গেল ঃ[১০]

সারণী—২

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ

খাত	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ
কৃষি ও সেচ এবং শিল্প ঃ নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ কর্মসূচী, পুকুর খনন, মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্যখামার, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বন উন্নয়ন ও ফলমূল ও শাক-সব্জীর চাষ, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন, জল নিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ, কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতাসমূহ প্রভৃতি।	৩০%	৪০%

(ক্রমাগত)

বস্তুগত অবকাঠামো ঃ		
পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, ছোট ছোট সেতু, কালভাট ইত্যাদির উন্নয়ন (গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা) হাট ও বাজার, গুদামজাতকরণের সুযোগ সুবিধা, কম্যুনিটি সেন্টার, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি।	২৫%	৩৫%
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ঃ		
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ তৎপরতা প্রভৃতি।	১৭·৫%	২৭·৫%
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ		
খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রভৃতির উন্নয়ন	৫%	১০ %
বিবিধ কার্যাবলী ঃ		
জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে) প্রভৃতি।	২·৫%	৭·৫%

পরবর্তীকালে অর্থাৎ জুলাই, ১৯৮৫ সালে পরিকল্পনা কমিশন উপজেলা পরিষদের জন্য সংশোধিত নির্দ্দেশনামালা প্রকাশ করে। এই নির্দ্দেশনামালায় নিম্নলিখিত নয়টি খাত দেখানো হয়েছে ঃ

(ক) কৃষি ও সেচ
(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
(গ) পরিবহন ও যোগাযোগ
(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা
(ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন
(চ) স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা
(ছ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
(জ) ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ত কর্মসূচী এবং
(ঝ) বিবিধ কার্যাবলী।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী (এ,ইউ,ডি,পি)-এর অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীর একটি খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের অনুসরণীয় পদ্ধতি অপর পৃষ্ঠায় দেয়া গেল ঃ[১১]

সারণী—৩

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ

	খাত	উন্নয়ন জমার ন্যূনতম অংশ	উন্নয়ন জমার সর্বোচ্চ অংশ
(ক)	**কৃষি ও সেচ ঃ** নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ কর্মসূচী, পুকুর খনন, মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণসহ সামাজিক বন উন্নয়ন এবং ফলমূল ও শাক সব্জীর চাষ, হাঁস মুরগীর ও গবাদি পশুর উন্নয়ন, জল নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো।	১৫%	২৫%
(খ)	**ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতা ইত্যাদি।	৫%	১০%
	বস্তুগত অবকাঠামো ঃ		
(গ)	**পরিবহন ও যোগাযোগ ঃ** রাস্তা নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট ইত্যাদির নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৭·৫%	৩০%
(ঘ)	**গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা ঃ** হাট ও বাজার, গুদামজাত করণের সুযোগ সুবিধা, কম্যুনিটি সেন্টার, পল্লী পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে পায়খানা নির্মাণ প্রভৃতি।	১০%	১৭·৫%
	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ঃ		
(ঙ)	**শিক্ষার উন্নয়ন ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন।	৫%	১২·৫%
(চ)	**স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা ঃ** স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু, যুবক ও মহিলা কল্যাণসহ সমাজ সেবা কার্যাবলী।	৭·৫%	১৫%

(ক্রমাগত)

(ছ) **ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ** খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রভৃতির উন্নয়ন। ২·৫% ৭·৫%

(জ) ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লীপূর্তকর্মসূচী বাস্তবায়ন-এর জন্য পরিষদ সমূহকে অনুদান। ৫% ৭·৫%

(ঝ) **বিবিধ কার্যাবলী ঃ** জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (গ্রয়োজনবোধে উপজেলা জরীপ ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর তদারকী ব্যয় হিসাবে ০·৫% অর্থ এই খাত থেকে ব্যবহার করা যাবে)। ২·৫% ৫%

সারণী—৪

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ
১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সনে জারীকৃত নির্দ্দেশনামালার তুলনা

খাত	১৯৮৩ সনের নির্দ্দেশনামালা		১৯৮৫ সনের নির্দ্দেশনামালা	
	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ
১। কৃষি ও সেচ এবং শিল্প	৩০%	৪০%	২০%	৩৫%
(ক) কৃষি ও সেচ	—	—	১৫%	২৫%
(খ) শিল্প	—	—	৫%	১০%
২। বস্তুগত অবকাঠামো	২৫%	৩৫%	২৭·৫%	৪৭·৫%
(ক) পরিবহন ও যোগাযোগ	—	—	১৭·৫%	৩০%
(খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	—	—	১০%	১৭·৫%
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	১৭·৫%	২৭·৫%	১২·৫%	২৭·৫%
(ক) শিক্ষার উন্নয়ন	—	—	৫%	১২·৫%
(খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা	—	—	৭·৫%	১৫%
৪। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫%	১০%	২·৫%	৭·৫%
৫। ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ত কর্মসূচী	—	—	৫%	৭·৫%
৬। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫%	৭·৫%	২·৫%	৫%

কৃষি ও সেচ এবং শিল্প খাতে বরাদ্দ ১৯৮৩ সনের তুলনায় ১৯৮৫ সনের নির্দ্দেশনায় কমে গেছে ঃ ১৯৮৩ সনে এ খাতে ন্যূনতম বরাদ্দ ছিল ৩০% ও সর্বোচ্চ অংশ ৪০%; ১৯৮৫ সনে তা কমে যথাক্রমে হয়েছে ২০% ও ৩৫%।

অপরদিকে বস্তুগত অবকাঠামো খাতে ১৯৮৩ সনের ন্যূনতম ২৫% ও সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩৫% থেকে ১৯৮৩ সনে বেড়ে যথাক্রমে ২৭·৫% ও ৪৭·৫% হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৩ সনের নির্দ্দেশনামালার তুলনায় ১৯৮৫ সনের নির্দ্দেশনামালায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক খাতে যেমন---কৃষি, ও বন, মৎস্য ও পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপর দিকে বস্তুগত অবকাঠামো খাতে আগের তুলনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ তাত্ত্বিক দিক

উপজেলা প্রশাসন ম্যানুয়েল-এর প্রথম খণ্ডে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা অর্থ ও পরিকল্পনা অফিসার (বর্তমানে উপজেলা অর্থ অফিসার) ও উপজেলা প্রকৌশলীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউ,এন,ও তাঁদের নিজ নিজ কাজে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। গবেষণাকালীন সময়ে উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে উপজেলা অর্থ অফিসারের পদটি শূন্য ছিল। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উপজেলা অর্থ অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব উপজেলা প্রকৌশলীর ওপর বর্তায়। আই, এম, ই, ডি-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে প্রকল্প প্রণয়ন অধিকাংশ উপজেলাতেই উপজেলা প্রকৌশলী করে থাকেন। কোন কোন উপজেলাতে ইউ, এন, ও, ও উপজেলা অর্থ অফিসার প্রকল্প প্রণয়ন করেন।[১২] উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদগুলোকে নিম্ন লিখিত বিষয় অবগত থাকতে হবে ঃ[১৩]

(ক) চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলিত জাতীয় সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারগুলো।

(খ) উপজেলা পরিষদগুলো কেবলমাত্র সেইসব প্রকল্পই গ্রহণ করবে যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং যে সকল প্রকল্প জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নিম্নে বার্ষিক উপজেলা কর্মসূচী (এ,ইউ,ডি,পি) প্রণয়ন প্রক্রিয়া দেয়া গেল ঃ

১। প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ঃ উপজেলা পরিষদ যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে তা অবশ্যই উপজেলা পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামো (উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী)-এর অন্তর্গত হতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের ব্যাপারেও নির্দ্দেশনামালা অনুসরণ করতে হবে।

একক প্রকল্পগুলোর জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক সীমাসমূহ মেনে চলতে হবে ঃ[১৪]

(ক) নির্মাণ প্রকল্পসমূহর জন্য ২০ লক্ষ টাকা

(খ) অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ১০ লক্ষ টাকা

অবশ্য এই সীমা সারণী—৩ এ প্রদর্শিত শতাংশওয়ারী, খাতওয়ারী বরাদ্দেরও শর্তাধীন থাকবে।

প্রকল্প চিহ্নিতকরণের স্তরে প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্যরা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে যাবেন এবং উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করে তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করবেন।

২। **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন** ঃ প্রকল্প চিহ্নিত করণের পর প্রকল্প প্রস্তাবগুলো নির্ধারিত ছক (পরিশিষ্ট খ) অনুসারে উপজেলা পরিষদের নির্দ্দেশনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হবে। তিনিই উক্ত প্রকল্পসমূহ পরিষদের বিধিমালা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্প নির্বাচন কমিটির বিবেচনাকল্পে পেশ করার জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা** ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারিগরী বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করার জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনবোধে পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে কিংবা সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। নির্দ্দেশনায় বলা হয়েছে যে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে কোন প্রকল্প নেয়া যাবেনা।

৪। **প্রকল্প নির্বাচন** ঃ প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদে একটি "প্রকল্প নির্বাচন কমিটি" থাকবে। নির্বাচিত সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ জনের বেশী হবে না। উক্ত কমিটির সদস্যরা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করে তাঁদের উপস্থিতিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরীক্ষা ও নির্বাচন (বাছাই) করবেন। প্রকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে পরিষদ নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করবে ঃ[১৫]

(ক) কেবলমাত্র সেই সকল প্রকল্পই গ্রহণ করতে হবে যা দু'বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

(খ) কোন একটি প্রকল্পের ব্যয় বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত কোন একটি বিশেষ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।

(গ) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্বকর্ম সংস্থাপন ও উপার্জন বৃদ্ধি মূলক তৎপরতাসহ কর্ম সংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

৫। **প্রকল্প অনুমোদন** ঃ উপজেলা পরিষদগুলো তাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষরূপে কাজ করবে। প্রত্যেকটি প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদের বৈঠকের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। মতৈক্যের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই ভোটের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে।

উপজেলা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত অফিসারগণ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ বাস্তব দিক

১। **প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ঃ** অনুসন্ধ্যান করে দেখা গেছে যে ১২৩টি উপজেলার সবগুলো বা অধিকাংশ উপজেলায় এখনো প্রকল্প নির্বাচন কমিটি গঠিত হয় নি। যেখানে এরূপ কমিটি গঠিত হয়েছে সেখানে উক্ত কমিটির সদস্যরা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে যান না।[১৬] বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলার মধ্যে যে ৩০টি উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে বলে দাবী করেছে তারা কেবলমাত্র পাঁচ বৎসর মেয়াদী একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। অবশিষ্ট উপজেলা পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য প্রকল্প তালিকাও প্রস্তুত করেনি। অধিকাংশ উপজেলা পরিষদই বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি।[১৭] এর ফলে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন এডহক ভিত্তিতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিজেরাই প্রকল্প চিহ্নিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, মির্জাপুর উপজেলায় একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও অনুমোদনে কর্তৃত্ব করতে দেখা গেছে।

২। **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ঃ** তাত্ত্বিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত ছক অনুসারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হবার কথা। কিন্তু আই এম ইডি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে পরিকল্পনা প্রণীত হয় না। এর অন্যতম কারণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপর্যাপ্ততা। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন তথা পিপি তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৮] এমনও দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে না জানিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে ধামরাই উপজেলার মৎস্য বিভাগের ৭টি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত প্রকল্প গুলোর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্তরে উপজেলা মৎস্য অফিসারের অংশগ্রহণ ছিল না। পরবর্তী সময়ে দুটো প্রকল্পের কাজের চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের জন্য নথি পাঠানো হলে তিনি এই বলে নথিটি ফেরত দেন যে এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এরপর উক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে আর কিছু অবহিত নন।

৩। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ঃ** সম্ভাব্যতা, উপযোগিতা ও চাহিদা যাচাই না করে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।[১৯] যেহেতু প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও প্রণয়ন এডহক ভিত্তিতে হয় সেহেতু সম্ভাবতা সমীক্ষা করার প্রশ্নই উঠে না। উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে এ ধরণের কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে লেখকের চোখে পড়েনি।

৪। **প্রকল্প নির্বাচন ঃ** কতিপয় উপজেলা পরিষদ জানায় যে পরিষদের বৈঠকেই প্রকল্প বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান এবং বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী অনুসরণ করা হয়। যেমন,---উক্ত উপজেলাগুলোতে দুই বৎসরের অধিক মেয়াদী প্রকল্প নির্বাচন করা হয়নি। কিন্তু অন্য শর্তগুলো লংঘন করা হয়েছে যেমন ঃ[২০]

(ক) কয়েকটি উপজেলা পরিষদ (যেমন সিংড়া, নাচোল, চন্দনাইশ, পাঁচবিবি, শাহজাদপুর কতিপয় প্রকল্পে নির্দিষ্ট খাতের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের এক তৃতীয়াংশের অধিক বরাদ্দ করেছে।

(খ) বস্তুগত অবকাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রকল্প প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক খাতগুলো যেমন কৃষি ও বন, মৎস্য ও পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ৬৪টি উপজেলা পরিষদের খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় থেকে তা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে ঃ

সারণী—৫

খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয়

(১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫) (লক্ষ টাকায়)

খাত	পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশমালা অনুযায়ী বরাদ্দের হার।	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দ (বার্ষিক প্রাপ্ত অর্থের%)		উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের পরিমান (বরাদ্দের%)	
		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। কৃষি, সেচ ও শিল্প	৩০-৪০%	৭৪৬·১০ (২৮%)	৮৩১·৭৫ (২৬%)	৬৫২·১০ (৮৭%)	৬৬৯·৩৭ (৮০%)
২। বস্তুগত অবকাঠামো	২৫-৩৫%	৬৯২·১৭ (২৬%)	১১১৬·৮৩ (৩৫%)	৭৬৮·২৩ (১১১%)	৯৯০·৫৪ (৮৯%)
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	১৭·৫-২৭·৫%	৬২৪·৩০ (২৩%)	৭৯০·৬৫ (২৫%)	৫৫৭·৫৯ (৮৯%)	৬৬৬·৭৯ (৮৪%)
৪। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫-১০%	১৪৬·২৪ (৫%)	১৬৮·৯৫ (৫%)	১২৭·৯৫ (৮৭%)	১৩২·৯৫ (৭৯%)
৫। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫-৭·৫%	৭৭·২১ (৩%)	২৩৪·৬৮ (৭%)	৭১·৬৬ (৯৩%)	১৩৪·০৭ (৫৭%)
মোট ঃ		২২৮৬·০২	৩১৪২·৮৬	২১৭৭·৫৩ (৯৫%)	২৫৯৩·৭২ (৮৩%)

সূত্র ঃ বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ ঃ উপজেলা কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১৯৮৬)

সারণী—৫ হতে দেখা যায় যে ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালে কৃষি, সেচ ও শিল্প খাতে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৩০-৪০%-এর স্থলে যথাক্রমে ২৮% ও ২৬% বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য খাতে বরাদ্দ মোটামুটি নীতিমালা অনুসারে হয়েছে।

১৯৮৫-৮৬ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় সারণী ৬-এ দেখানো হলো ঃ

সারণী—৬

১৯৮৫-৮৬ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

খাত	পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশমালা অনুযায়ী বরাদ্দের হার।	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দ (প্রাপ্ত অর্থের%)	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (বরাদ্দের%)
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	১৫-২০%	৫৩৮·২৩ (১৭%)	৩১৯·৮৬ (৫৯%)
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৫-১০%	৯৩·০৮ (৩%)	৪২·৩৩ (৪৫%)
৩। পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৭·৫-৩০%	৯১৯·৫৫ (২৮%)	৭৯০·০৪ (৮৬%)
৪। গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	১০-১৭.৫%	৩৭৪·৯৯ (১২%)	২০৭·০৯ (৫৫%)
৫। শিক্ষার উন্নয়ন	৫-১২·৫%	৪৪৮·৯৬ (১৪%)	২৫৯·৩৭ (৫৮%)
৬। স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা	৭·৫-১৫%	১৭৮·৭৪ (৬%)	৮০·৬৫ (৪৫%)
৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২·৫-৭·৫%	৭১·১৩ (২%)	৫৯.৭৮ (৮৫%)
৮। পল্লী পূর্তকর্মসূচীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে অনুদান	৫-৭·৫%	১৯২·৭০ (৬%)	১৩৭·৩৬ (৭১%)
৯। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫-৫%	১৪০·৬৪ (৪%)	৮২·৩০ (৫৯%)
মোট		২৯৫৮·০২ (১১%)	১৯৭৮·৭৫ (৬৭%)

সূত্র ঃ আই এম ইডি প্রতিবেদন (১৯৮৬)

সারণী ৬-এ লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৮৫-৮৬ সালে উপজেলা পরিষদ সমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ন্যূনতম হারের নীচে অর্থ বরাদ্দ করেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পে অধিক বরাদ্দ করেছে।

৫। **প্রকল্প অনুমোদন ঃ** তাত্ত্বিকভাবে উপজেলা পরিষদের বৈঠকে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। কার্যতঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও

প্রতিনিধি সদস্যরাই প্রকল্প অনুমোদন করে থাকেন। উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে সরকারী সদস্যদেরকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। মির্জাপুর উপজেলা পরিষদের সভায় লক্ষ্য করা গেছে যে সরকারী ও প্রতিনিধি সদস্যরা একে অন্যের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাজমান তিক্ত সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে।

সমস্যাবলী

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে এ পার্থক্যের কারণ কি? প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ঃ

(১) উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গরীব জনসাধারণের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের অভাব

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন পদ্ধতির পেছনে যে অনুমান কাজ করে তাহলো স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র নির্বাচিত পরিষদেরই ভূমিকা থাকবে না, বরং উপকারভোগীদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের স্তরে "প্রকল্প নির্বাচন কমিটির" সদস্যদের প্রতিটি ইউনিয়নে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করার কথা নির্দেশমালায় বর্ণিত আছে। আমরা যদি ধরে নেই যে উক্ত কমিটির সদস্যরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে প্রকল্প চিহ্নিত ও নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যান, তাহলেই কি স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত ও নির্বাচিত হবে? নিশ্চয়ই না। কারণ যাদের সাথে তারা আলাপ আলোচনা করবেন তাদের স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব মানুষের (ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ইত্যাদি) স্বার্থের অনুকূলে নয়। এটা তাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে। ১৯৭৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ওপর চালিত একটি জরীপে দেখা গেছে যে তাদের ৬০% ভাগ মাথাপিছু ৭·৫ একরের বেশী জমির মালিক এমন এক দেশে যেখানে ৭০% বেশী কৃষক-এর মাথাপিছু ২·৫ একরের কম জমি রয়েছে। অনুসন্ধানে আরো দেখা গেছে যে তাদের প্রায় অর্ধেক সরকারী অফিসে আসার পর অতিরিক্ত জমি অর্জন করেছেন।[১১] অনুরূপভাবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বার্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থের অনুকূলে নয়। শুধু কি তাই? উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে সারণী ৭ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী—৭

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের জমির মালিকানার প্রকৃতি

জমির মালিকানা (একর)	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সংখ্যা	শতকরা হার
ভূমিহীন	—	—
০·৫—২·৪৯ (ক্ষুদ্র কৃষক)	—	—
২·৫—৭·৪৯ (মাঝারী কৃষক)	৮	২০
৭·৫—তদুর্দ্ধে (ধনী কৃষক)	৩২	৮০
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক ৪০ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সারণী ৭ থেকে দেখা যায় যে ৮০% চেয়ারম্যান হলেন ধনী কৃষক, অন্যদিকে মাত্র ২০% জন মাঝারী কৃষক। সংগত কারণেই বলা যায় যে তাদের স্বার্থ গরীব মানুষের স্বার্থের অনুকূলে নয়। উল্লেখিত উপজেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে গরীব জনগণের অংশ গ্রহণ নেই বললেই চলে। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া 'এলিটিস্ট' বলা যায়। এই বক্তব্যের সমর্থন নিলে উক্ত চেয়ারম্যানদের নিম্নলিখিত মতামত থেকে।

সারণী—৮

উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গরীব জনগণের অংশগ্রহণের মান।

অংশগ্রহণের মান	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সংখ্যা	শতকরা হার
অত্যন্ত সন্তোষজনক	৬	১৫
সন্তোষজনক	১২	৩০
সন্তোষজনক নয়	২২	৫৫
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

৪০ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ২২ জন (৫৫%) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গরীব জনগণের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। অংশগ্রহণ বলতে তারা প্রকল্প প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে ভূমিকার কথা বলেছেন। পাঁচটি উপজেলার সরকারী সদস্যরাও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

(২) উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি

উন্নয়ন পরিকল্পনার দুটো অত্যাবশ্যক দিক হলো খাতওয়ারী ও এলাকা ভিত্তিক (Spatial) পদ্ধতি।[১১] খাতওয়ারী পরিকল্পনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যথা---কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, শক্তি ইত্যাদি খাতের এককভাবে বা একই সঙ্গে উন্নতি বিধান। এই পদ্ধতির অন্যতম দুর্বলতা হলো এটা এলাকার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তারতম্য, সম্ভাবনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করেছে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এই পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা উল্লেখ করা হলেও কিভাবে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে অবহেলা করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্ব উদ্দেশ্য যথা---সম্পদের অধিকতর সুষম বন্টনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অপরদিকে এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি হলো মূলতঃ আঞ্চলিক পরিকল্পনা পদ্ধতি। এর তিনটি দিক হচ্ছে ঃ (১) অর্থনৈতিক ; (২) সামাজিক ও (৩) পরিবেশগত। উক্ত পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অঞ্চলগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) অর্থনৈতিক অঞ্চল ঃ (ক) গতিশীল অঞ্চল ; (খ) সম্ভাবনাময় অঞ্চল ও (গ) সমস্যা জর্জরিত অঞ্চল।

(২) সামাজিক অঞ্চল ঃ (ক) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চল (খ) অর্থনৈতিকভাবে গরীব অঞ্চল যেখানে মাথাপিছু আয় খুব কম ; ও (গ) গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চল।

(৩) পরিবেশগত অঞ্চল ঃ (ক) পরিবেশগতভাবে ধংশপ্রাপ্ত অঞ্চল (খ) যে অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন ও (গ) যে অঞ্চলে বিশেষ পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুফল সুষম বন্টনের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনায় একই সঙ্গে খাতওয়ারী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থাকতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন খাতওয়ারী ও এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির একত্রীকরণ।

বাংলাদেশের পরিকল্পনা পদ্ধতি মতঃ খাতওয়ারী ভিত্তিক। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনামালায় খাতওয়ারী ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু এলাকা ভিত্তিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু উপেক্ষা করা হয়নি, বরং খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে উপজেলাগুলোর আঞ্চলিক তারতম্য, বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন তথ্য ব্যবস্থা

যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের পরিসংখ্যানের ওপর। উন্নয়ন প্রকল্প সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য উপজেলা পর্যায়ে উন্নত তথ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখনো উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থা অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো পল্লী উন্নয়নের জন্য সুসংহত জাতীয় কলাকৌশলের অভাব। বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিসংখ্যান ঐতিহাসিকভাবে প্রশাসনের উপজাত হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে।[৩] তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কদাচিৎ জনসাধারণের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

সারণী-৯এ উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত তথ্য ব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠেছে।

সারণী—৯

উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত তথ্য ব্যবস্থা

জরীপ হয়েছে	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২	৩০
না	২৮	৭০
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সারণী ৯ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ৭০% উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেছেন যে তাদের উপজেলায় কোন জরীপ করা হয়নি। এর ফলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখিত ৫টি উপজেলা সফরের সময় পরিষদ সদস্যদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তারা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫ প্রকাশিত)-এ উপজেলা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে (পরিশিষ্ট-গ) অবহিত আছেন কিনা। তারা সবাই 'না' সূচক উত্তর দিয়েছেন। এতে যোগাযোগের ফাঁক লক্ষ্য করা যায়।

(৪) উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব

এখনো উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব। এটা বার বার লক্ষ্য

করা গেছে যে বিভাজিত ক্ষমতা যদি প্রশাসনিক বা আর্থিক যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে অদক্ষতা অনিবার্য।[২৪] এই মূল কারণ হলো উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপক ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আই এম এস)-এর সদস্যদের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত করে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া। তাদের তাত্ত্বিক ও বাস্তব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে উপজেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দারুণভাবে ব্যহত হয়েছে। মাত্র ১ বৎসরের সামান্য বেশী সময়ের মধ্যে (৭ই নভেম্বর, ১৯৮২---১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪) দশটি পর্যায়ে ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করার ফলে মূলতঃ উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশমালা

(১) উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ঃ

এ সম্পর্কে বিকল্প সুপারিশমালা নীচে দেয়া হলো ঃ

(ক) উপজেলা পরিষদে গ্রামীণ গরীবদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা

উপজেলা পরিষদে পল্লীর দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের অভাবে পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাই পরিষদকে সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কোন কোন লেখক আমূল ভূমি সংস্কারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৫] কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ভূমি সংস্কার বা অন্য কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ গরীবদের পরিষদে বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। জাতীয় সরকার স্থানীয় ভূমিহীন সমবায় সমিতি বা গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য বা ক্ষুদ্র চাষী সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে দু'জন প্রতিনিধি প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের সদস্য পদে মনোনয়ন দান করতে পারেন।

এ প্রস্তাবের সুবিধে ও অসুবিধে উভয়ই আছে। সুবিধে হলো এই যে গ্রামীণ গরীবদের পরিষদে স্থান হবে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য। এর ফলে তাদের সমস্যা সমাধানে পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে। কিন্তু স্থানীয় গরীব সদস্যদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সমস্যা রয়েছে। সত্যিকার গরীব প্রতিনিধি নির্বাচন দুরূহ ব্যাপার।

(খ) উপজেলা পরিষদের সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদান

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষদ শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে অনেকের বিশ্বাস। গত ২৭-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিত টীম বিল্ডিং কোর্সের অন্যতম সুপারিশ ছিল যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক ভোটাধিকার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদান করা

উচিৎ। কিন্তু ভোটাধিকার প্রাপ্ত সরকারী সদস্যদের মোট সংখ্যা প্রতিনিধি সদস্যদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে না।[২৬] অনুরূপভাবে উল্লেখিত ৫টি উপজেলার সরকারী সদস্যগণ তাদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৪০ জন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মধ্যে ৩৬ জন (৯০%) সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

(১) যদি সরকারী সদস্যদেরকে এরূপ অধিকার দেয়া হয়, তবে তারা বেসরকারী সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব করবেন। (২) সরকারী সদস্যরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। (৩) যেহেতু তারা স্থানীয় এলাকার অধিবাসী নন, সেহেতু তারা স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে তত বেশী জ্ঞাত নন।

যে ৪ জন চেয়ারম্যান সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে পরিষদে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এরূপ ভোটাধিকার প্রদান আবশ্যক। অন্যথায় পরিষদ ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের বিশেষ করে প্রতিনিধি সদস্যদের ক্রীড়ানক হবে। এ প্রসঙ্গে ভারত ও থাইল্যাণ্ডের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রধানগণ সবসময় তাদের নিজ দল ও এলাকার সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তাই দেখা যায় যে গ্রামীণ ক্ষমতা এলিটগণ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়নকে তাদের নিজ গ্রুপের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।[২৭]

টীম বিল্ডিং কোর্সের সুপারিশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো প্রয়োগিক। কোন কোন সরকারী সদস্যকে ভোটাধিকার প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে জটিল ব্যাপার।

(গ) বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব (Accountability)

বর্তমানে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের বাধ্যবাধকতা পালনের কার্যকর দায়িত্ব নেই বললেই চলে। ফলে পরিষদ অনেক সময় তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হতে পারে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) উপজেলা পরিষদের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ স্থির করা অতীব প্রয়োজন। নির্বাচিত জেলা পরিষদই উক্ত কর্তৃপক্ষ হতে পারে।

(২) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের জবাব-দিহি করার একটা সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তাহলে পরিষদে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে।

(২) উপজেলা পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিরসন

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিরসনকল্পে খাতওয়ারী ভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা তুলে দেয়া। উপজেলার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে অনুন্নত এলাকাগুলোতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির ওপর প্রয়োগিক গবেষণা করা প্রয়োজন।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সঠিক তথ্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে সব তথ্যাবলী প্রয়োজন সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) উপজেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য
(২) উপজেলার জনসাধারণ ও জনতত্ব সম্পর্কিত তথ্য
(৩) উপজেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য

প্রথমতঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসকে লীড (Lead) এজেন্সী হিসাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই এজেন্সীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও বিস্তার করা যেতে পারে। যে সব উপজেলায় এখনো আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি সেখানে জরুরী ভিত্তিতে জরীপ কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক। লীড এজেন্সীর কাজ তত্ত্বাবধান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার প্রমুখকে নিয়া উপজেলা তথ্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হবে। এ ছাড়া জাতীয় সরকারের উপজেলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী যথাসময়ে উপজেলা পরিষদে পাঠানো আবশ্যক।

(৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ব্যাপক ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণদান

উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও মানসিকতার বিকাশের জন্য ব্যাপক ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত সিনিয়র সহকারী সচিব, ইউ,এন, ও প্রমুখের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কোর্সের কথা উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৬টি কোর্সে মোট ১৮২ জন অংশ গ্রহণকারীর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৬৯ (৩৮%)। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একমাত্র ইউ,এন,ও এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং এখনো

প্রায় ৪০০ জন ইউ,এন,ও-র উক্ত কোর্সে প্রশিক্ষণ হয়নি, সেহেতু অধিক সংখ্যক ইউ,এন,ওকে (মোট অংশগ্রহণকারীর কমপক্ষে ৫০%) এই কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞানকে উপজেলার অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিস্তার ঘটাতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উপজেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-এর ওপর অবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে উপজেলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রকে ব্যবহার করা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। উক্ত কোর্স সম্পর্কে আরো কিছু সুপারিশ করা গেল ঃ (ক) প্রজেক্ট সাসটেইন-এবিলিটির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ; (খ) বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পদ্ধতি শীর্ষক একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা ; ও (গ) কোর্সের মেয়াদ ২ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩ মাস করা। অনুরূপভাবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিকেন্দ্রী-করণ ও উপজেলা পদ্ধতির ওপর একটি মডিউল থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি, উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উন্নতি বিধানের জন্য টীম বিল্ডিং কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

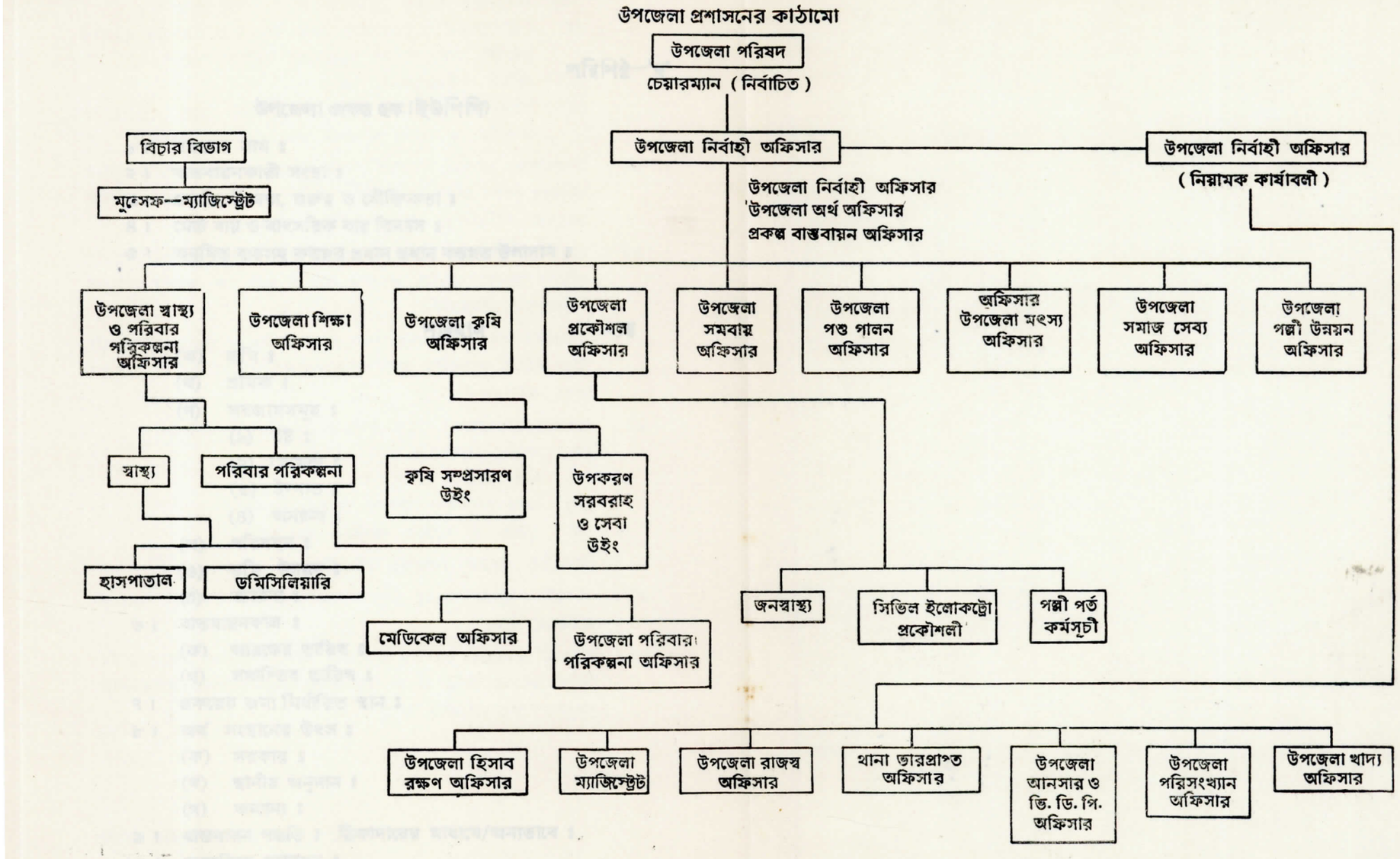
উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো
উপজেলা পরিষদ
চেয়ারম্যান (নির্বাচিত)
বিচার বিভাগ
মুন্সেফ—ম্যাজিস্ট্রেট
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
(নিয়ামক কার্যাবলী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা অর্থ অফিসার
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
উপজেলা কৃষি অফিসার
উপজেলা প্রকৌশল অফিসার
উপজেলা সমবায় অফিসার
উপজেলা পশু পালন অফিসার
অফিসার উপজেলা মৎস্য অফিসার
উপজেলা সমাজ সেব্য অফিসার
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
স্বাস্থ্য
পরিবার পরিকল্পনা
কৃষি সম্প্রসারণ উইং
উপকরণ সরবরাহ ও সেবা উইং
হাসপাতাল
ডমিসিলিয়ারি
মেডিকেল অফিসার
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
জনস্বাস্থ্য
সিভিল ইলোকট্রো প্রকৌশলী
পল্লী পর্ত কর্মসূচী
উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার
উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট
উপজেলা রাজস্ব অফিসার
থানা ভারপ্রাপ্ত অফিসার
উপজেলা আনসার ও ভি. ডি. পি. অফিসার
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার
উপজেলা খাদ্য অফিসার

পরিশিষ্ট—'খ'

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

১। প্রকল্পের নাম ঃ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ

৩। প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ঃ

৪। মোট ব্যয় ও বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস ঃ

৫। অনুমিত ব্যয়সহ কাজের প্রধান প্রধান বস্তুগত উপাদান ঃ

	পরিমান	ব্যয়
(ক) জমি ঃ		
(খ) শ্রমিক ঃ		
(গ) সরঞ্জামসমূহ ঃ		
(১) ইট ঃ		
(২) সিমেন্ট ঃ		
(৩) ইস্পাত ঃ		
(৪) অন্যান্য ঃ		
(ঘ) পরিবহন ঃ		
(ঙ) ভূমি উন্নয়ন ঃ		
(চ) অন্যান্য ঃ		

৬। বাস্তবায়নকাল ঃ

(ক) আরম্ভের তারিখ ঃ

(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ

৭। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান ঃ

৮। অর্থ সংস্থানের উৎস ঃ

(ক) সরকার ঃ

(খ) স্থানীয় অনুদান ঃ

(গ) অন্যান্য ঃ

৯। বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ ঠিকাদারের মাধ্যমে/অন্যভাবে ঃ

১০। জনশক্তির প্রয়োজন ঃ

(ক) দক্ষ ঃ

(খ) অদক্ষ ঃ

১১। সমাপ্তির পর প্রকল্পকার্য অথবা সুবিধাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ঃ

(ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা এবং তাঁহাদের প্রশিক্ষণ ঃ

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ ও নিঃশেষে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা ঃ

(গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ

(ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি ঃ

১২। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ কোন প্রকল্প আছে কি ? যদি থাকে তাহা হইলে প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

১৩। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হইতে পূর্ণ সুফল লাভ করিতে হইলে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরণের সম্পূরক বিনিয়োগের প্রয়োজন ?

১৪। প্রকল্পটির জন্য জমি দখল করা প্রয়োজন কি ? যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রকল্পটির জন্য জমি দখলের উদ্দেশ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

১৫। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমিত/প্রত্যাশিত সুফল ঃ

(ক) অর্থের হিসাবে ঃ

(খ) কর্মসংস্থানের হিসাবে ঃ

(গ) আর্থ-সামাজিক কল্যাণ (বর্ণনা করুন) ঃ

(ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমিত অনুপাত ঃ

১৬। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে হইয়াছিল ?

১৭। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনরূপ জরীপ/সমীক্ষা চালানো হইয়াছে কি ?

১৮। প্রকল্পটি প্রণয়নের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প-সমূহ গ্রহণের জন্য প্রদত্ত সংশোধিত নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে কি ?

উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট—'গ'

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০

(উপজেলা উন্নয়ন সম্পর্কিত কতিপয় তথ্যাবলী) ঃ

সেচ

১। ---------- উপজেলা পরিষদ ৩·৪৫ লাখ একর জমিতে সেচ করবে। (পৃঃ-১৯৮)।

২। প্রতিটি উপজেলায় সেচের জন্য সর্বাধিক ৫,০০০ একরের এবং পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০,০০০ একরের ছোট প্রকল্প নেয়া হবে। পরিকল্পনায় এ ধরনের প্রায় ৫০০টি প্রকল্পের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট ছোট প্রকল্পের প্রকৌশল ও কারিগরি দিক বিডব্লিউডি স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা করে নির্ধারণ করবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর অর্পণ করা যেতে পারে। (পৃঃ-১৯৯)।

পশুশক্তির বংশগত উন্নয়ন

৩। কৃত্রিম প্রজনন ও অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের যে দেশীয় পশু রয়েছে তাদের বংশমানের উন্নয়ন করা হবে। স্বাভাবিক ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত ও দুর্গত অঞ্চলসমূহে উন্নত প্রজননক্ষম ষাড় সরবরাহ করা হবে। এসব ষাঁড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে উপ-জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। ------গ্রাম পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বংশগত উন্নয়নের কৌশল প্রসারিত করার জন্য উপজেলায় অবস্থিত প্রতিটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের দু'জন সরকারী প্রজননকারী কৃত্রিম প্রজননের জন্য পূর্ব ব্যবস্থা মোতাবেক ইউনিয়ন পর্যায়ে সফর করবেন। (পৃঃ ২০৬-২০৭)।

খামার বনায়ন

৪। ---------- উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান করে তাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে চারাগাছ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সকল উপজেলায় নার্সারী ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ডি,এই'র অধীনস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় বেসরকারী চারা রোপনকারীদের জন্য এই নার্সারীগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। এই নার্সারীগুলো থেকে জনসাধারণের মধ্যেও চারাগাছ সরবরাহ করা হবে। (পৃঃ ২২২)।

৫। ---------- প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিধানে তৃতীয় পরি-কল্পনায় সীমিত পরিসরে উপজেলা কর্মসংস্থান সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। (পৃঃ ২৩৫)।

৬। প্রতিটি উপজেলায় সমন্বিত সেবাকেন্দ্র তথা বাজারের ন্যূনতম মান বজায় রেখে অন্ততঃ একটি পল্লী গ্রোথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। (পৃঃ ২৩৫)।

পাদটিকা

১। হাসানাত আব্দুল হাই, লোকাল লেভেল প্লানিং ইন বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, মার্চ ১৯৮২), পৃষ্ঠা--৫-৬।

২। জি, শাহ, ডিসেন্ট্রালাইজড প্লানিং ইন এ সেন্ট্রালাইজড ইকোনমী ঃ এ স্টাডি অব সর্বোদয়া প্রোগ্রাম ইন এ তালুক ইন পিটার বর (সম্পাদিত), রুরাল সাউথ এশিয়া, লিনকেজ, চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, লন্ডন, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২০৪।

৩। পরিকল্পনা কমিশন, তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০। ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৪১।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রিপোর্ট অফ দি কমিটি ফর এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিঅরগানাইজেশন/রিফর্ম, জুন, ১৯৮২।

৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নপ্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বৎসর, ঢাকা, আগষ্ট, ১৮৯৬, পৃষ্ঠা (ক)।

৬। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, এ হ্যান্ডবুক ফর উপজেলা ট্রেনিং, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩৪। পরবর্তীকালে বিষয়গুলোর সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

৭। দৈনিক সংবাদ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৮৬।

৮। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, উপজেলা উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা, ১২।

৯। ডি, এস, ইউসুফ হায়দার, ডেভেলপমেন্ট—দি উপজেলা ওয়ে, (ঢাকা, ঢাকা প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ১৫৯)।

১০। পরিকল্পনা কমিশন, উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশনামালা ঃ জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় (জুলাই, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৪-৫।

১১। পরিকল্পনা কমিশন, উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশনামালা ঃ জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় (জুলাই, ১৯৮৫-তে সংশোধিত), পৃষ্ঠা ৪-৫।

১২। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯।

১৩। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫।

১৪। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১

১৫। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬

১৬। এ, এম, এম, শওকত আলী, পলিটিক্স, ডেভেলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা (ঢাকা ঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, (১৯৮৬), পৃষ্ঠা–১৩৯-১৪১

১৭। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্টা-৯

১৮। দৈনিক সংবাদ, ৫ই জুন, ১৯৮৬।

১৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ, পূর্বোক্তা, পৃষ্ঠা ৭১।

২০। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

২১। আতিউর রহমান, রুরাল পাওয়ার ষ্টাকচার, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১) পৃষ্ঠা ঃ ২৭-৩০।

২২। আর, পি, মিশ্র ও অন্যান্য, রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া। নিউ দিল্লী ঃ ভিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪)

২৩। এ, কে, এম, গোলাম রব্বানী, "ডাটা এণ্ড ইনফরমেশন ফর লোকাল লেভেল প্লানিং", বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ, ১৯৮৩ ঃ ২২

২৪। ইউ, কে, হিকস, ডেভেলপমেন্ট ফ্রম বিলো। (অক্সফোর্ড ঃ দি ক্লারানডন প্রেস, ১৯৬১) পৃষ্ঠা ৫০৫।

২৫। আবু আহম্মদ আব্দুল্লাহ, লোকাল লেভেল প্লানিং ঃ র‍্যাসনেল অবজেকটিভস এণ্ড মোডালিটিস (খসড়া প্রধান রিপোর্ট, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান), আগষ্ট ৬, ১৯৮৫।

২৬। সৈয়দ নকীব মুসলিম ও মোশারফ হোসেন, ফ্রম ফরমাল টু ইনফরমাল, এ রিপোর্ট অন টিম বিল্ডিং কোর্স, (সাভার, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৫১।

২৭। এ পি ডি সি, প্রজেক্ট রিভিউ মিটিং অন ডিসেন্ট্রালাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, (কুয়ালালামপুর, ২৯শে সেপ্টেম্বর--৩রা অক্টোবর ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।